আবরারের মৃত্যু এবং ছাত্র রাজনীতি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

| ঢাকা , রোববার, ০৩ নভেম্বর ২০১৯

দ্বিতীয় পর্ব

আবরারের নির্মম হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছে জাতিসংঘ, যুক্তরাজ্য এ হত্যায় শুধু মর্মাহত হয়নি বিস্মিতও হয়েছে, জার্মানি দুঃখ প্রকাশ করেছে, ফ্রান্স আবরারের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এই হত্যায় হতবাক হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো এ হত্যার সবিস্তার বর্ণনা প্রচার করেছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তির সমালোচনা করার জন্য এমন একটি নির্মম হত্যা কেউ সমর্থন করছে না; গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা সবাই উল্লেখ করেছে। লেখার জন্য, মত প্রকাশের জন্য কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে- সভ্য জগতে কোনভাবেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই মৃত্যুতে মর্মাহত, নিজে আবরারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইতালির একনায়ক মুসোলিনি, জার্মানির হিটলার এবং স্পেনের স্বৈরাচার ফ্রাংকোও কাউকে কথা বলতে দিতেন না, তারা চাইতো সবাই শুধু তাদের বন্দনা করুক। স্বৈরচারেরা অন্যের কোন কথাই শুনতে চায় না; তারা যা বলবে তাই মানতে হবে, তা শুনতে হবে, তা পালন করতে হবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও কোন ধার্মিক ধর্ম সম্পর্কে বা বিপক্ষে কোন যুক্তি মানতে নারাজ; তার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সত্য কথনকে অনুভূতিতে আঘাত হিসেবে বিবেচনা করে লংকাকাণ্ড বাঁধিয়ে দেন। সত্যকে উভয় পক্ষ ভয় করে; ভয় করে বলেই এরা নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে বিরোধী পক্ষকে দমিয়ে রাখে। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে থাকে। দেশের পতাকা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালত একবার রায়ে উল্লেখ করেছিল যে, নিজের আয়ত্তাধীন পতাকা ছিঁড়ে, পতাকায় আগুন লাগিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার স্বাধীন অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে, কিন্তু অন্যের অধিকারভুক্ত পতাকা ছিনিয়ে এনে ছিঁড়তে বা তাতে আগুন লাগাতে পারবে না। খেলার মাঠে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অনেক খেলোয়াড় পতাকার ডিজাইনে প্যান্ট বা ব্রা বানিয়ে দিব্যি মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমাদের মতো দেশে এমন কর্মকাণ্ডকে দেশ ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতি আঘাত মনে করা হয়ে থাকে। মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয় বলে প্রতিটি ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডে ভুলত্রুটি থাকে, ভুলত্রুটি থাকে

বলেই আলোচনা, সমালোচনাও স্বাভাবিক। যারা উগ্র, যাদের মাথা মোটা তারা অন্যের যুক্তি খণ্ডাতে পারে না; যুক্তি খণ্ডানোর ক্ষমতা না থাকায় অন্যের মুখ বন্ধ করার ক্ষেত্রে এদের প্রধান অস্ত্র হকিস্টিক, ক্রিকেট স্ট্যাম্প আর পিস্তল।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের এক বা একাধিক চুক্তি হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। এসব চুক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চুক্তির শর্ত মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় হচ্ছে কোন সরকারের আমলে চুক্তিটি হলো। বিএনপি সরকারের আমলে হলে তা নিয়ে খুব বেশি উচ্চবাচ্য হয় না, কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা সব চুক্তিই গোলামি চুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা আওয়ামী লীগ বিরোধীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তখন চুক্তির শর্ত অনুকূল বা প্রতিকূল বিবেচ্য বিষয় হয় না। পাকিস্তান আমলে তো কমিউনিস্টদের নাস্তিক আর ভারতের দালাল নাম দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান হওয়ার পর থেকেই কয়েকজন জনপ্রিয় নেতাকে ভারতের চর, ভারতের দালাল বলে তাদের দমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ? রাওয়ার্দী, বদরুদ্দীন উমর- এরা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ও কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচারণায় ভারতীয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। একে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে,

বাক স্বাধীনতা প্রাতষ্ঠা করতে আমরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি; কিন্তু এখনও যদি পাকিস্তানি ধাঁচে বাক স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অর্থহীন হয়ে যায়।

৫৫ হাজার বর্গমাইলের এ ভূখণ্ডে বিরোধী পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার মাস্তানি শুরু হয়েছে সেই পাকিস্তান আমল থেকে। আইয়ুব খান, মোনায়েম খান- এই দুই খানের আমলে বিরোধী দলকে ঠেঙ্গানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন বা এনএসএফ- এই ছাত্র সংগঠনটি ছিল আইউব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের ছাত্র ফ্রন্ট। এই এনএসএফের গুণ্ডামির প্রথম ভিকটিম হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক আবু মাহমুদ। সেই সময় এনএসএফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, তখন সব হলের ছাত্ররা এনএসএফ আতঙ্কে থাকত। ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হয় এই এনএসএফ তৈরির মাধ্যমে। এনএসএফের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী বিরোধী ছাত্রদের পেটাত, হল থেকে বের করে দিত, চাঁদাবাজি করত, খুশিমতো যে কোন ছাত্রনিবাসে সিনেমা জগতের অপ্সরীদের নিয়ে হইচই করে আনন্দ-ফূর্তি করত। এ ক্যাডার বাহিনীর মধ্যে শীর্ষ ক্যাডার পাচপাতুত, জমির আলী ও খোকার নামে সবাই কম্পমান থাকত। এই ক্যাডার বাহিনী গলায় সাপ ঝুলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াত। এদের কোমরে থাকত পিস্তল বা

চাহানজ কুড়ালু। ১৯৬৮ সনে সালমুল্লাহ মুসালম হলের একটি কক্ষে মদ্যপান অবস্থায় পাচপাতুতরের বুক ও তলপেটে ড্যাগার চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়। পাচপাতুতর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। অন্যদিকে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর নারায়ণগঞ্জের পতিতালয় থেকে খোকাকে ধরে এনে গুলি করে রেসকোর্স ময়দানের মাঝখানে ফেলে রাখে কে বা কারা। এই মৃতদেহটি বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে কয়েকদিন পড়েছিল রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে)।

ছাত্র সমাজের শিক্ষা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত দাবি বাস্তবায়নের কাজ ছাড়াও পাকিস্তান আমলে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন এনএসএফের গুণ্ডামি প্রতিরোধ করে দেশ, জাতি ও মানুষের স্বার্থে ভূমিকা রেখেছে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, বাষট্টিতে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ছিষট্টিতে ৬ দফার প্রচার, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি, ১১ দফার সংগ্রাম, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে ছাত্ররা। স্বাধীন বাংলাদেশেও ছাত্র রাজনীতি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে বিকশিত হচ্ছিল; কিন্তু সামরিক শাসকদের ছাত্র রাজনীতি কবজা করার বাসনা থেকে ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হতে থাকে। ১৯৭২ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সাতজন নিহত

হওয়ার পর দণ্ডপ্রাপ্ত হত্যাকারী শাফিউল আলম প্রধানকে জিয়াউর রহমানের মুক্তি দিয়ে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার কারণে অস্ত্রধারী ছাত্ররা খুন করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। সামরিক শাসকদের দেয়া ধনসম্পদের প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়ার মানসিক শক্তি ছাত্র নেতাদের ছিল না। চাঁদা তোলা আর টেন্ডারবাজির অবাধ লাইসেন্স বহু ছাত্র নেতাকে কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছে। বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হলে হলে বোমা তৈরি হতে লাগলো, অনেকে নিজের বোমায় নিজেই মরল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক দলের অঙ্গসংগঠনের ছাত্ররা বেপরোয়া হয়ে উঠল, শিক্ষাঙ্গনে বিরোধী পক্ষের সরব অবস্থান সহ্য করা হলো না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, দেশে যে দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের অঙ্গসংগঠনের ছাত্র ব্যতীত অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্বও অনুভব করা যায় না। কোন প্রণীত বা বিধিবদ্ধ আইন না থাকলেও ছাত্র সংগঠনগুলো এ রীতি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিএনপির ছাত্রদল বা জামায়াতে ইসলামের শিবিরের কোন কর্মকাণ্ড খুব বেশি দৃশ্যমান নয়, এখন বিরোধী কোন ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনেও সমবেত হতে পারছে না; অথচ বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামের যৌথ শাসনামলে শিবিরের দাপটে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না, কেউ একটু মাথাচাড়া দিতে চাইলে ধরে ধরে রগ কেটে দেয়া

হতো। শাবর কত ছাত্রের রগ কেটেছে তার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। বিএনপির ছাত্রদলও তখন এত বেপরোয়া ছিল যে, বিরোধী দলকে ঠেঙ্গানোর জন্য বিএনপির ছাত্রদলই যথেষ্ট বলে বেগম খালেদা জিয়া একবার আওয়ামী লীগকে হুমকি দিয়েছিলেন। অস্ত্রধারী ছাত্ররা শুধু টেন্ডারবাজি নয়, অনেককে অপহরণ করে হলে নিয়ে আটক করে নির্যাতন করেছে, পরিবারের লোকদের নিকট থেকে অপহৃত ব্যক্তির বিনিময়ে টাকা আদায় করেছে। হল দখল ও ত্রাস সৃষ্টি করে শক্তি প্রদর্শন করার পাশাপাশি অপহরণ বাণিজ্য তাদের বিনা শ্রমে সম্পদশালী করতে সহায়তা করে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একমাত্র ছাত্র ইউনিয়নই সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করেনি- সন্ত্রাস না করার জন্য ছাত্র ইউনিয়নকে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো উপহাস করে ‘হারমোনিয়াম পার্টি’ নামে ডাকতো।

ছাত্রদের অপরাধ জগতে প্রবেশের প্রধান কারণ হচ্ছে, ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে ক্রিয়াশীল। ১৯৭৭ সনে জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনৈতিক দলবিধি জারির পিপিআর মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিকে মূল রাজনৈতিক দলের আওতাভুক্ত করার পর ছাত্র রাজনীতি মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এরা অপরাধ করার সাহস পায় মূল দলের সমর্থনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদের সমীহ করে, অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করে। শাসকদলের অঙ্গসংঠনের ছাত্র নেতাদের প্রতি প্রশাসনের

এমন নমনীয় আচরণ লক্ষ্য করে সাধারণ ছাত্ররা একটি ভীতিজনক ম্যাসেজ পেয়ে যায়। দুর্দমনীয় ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এ ছাত্র নেতারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এ পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের লেখাপড়ার উন্নয়ন, গবেষণায় সমৃদ্ধ হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ না করে নিজ স্বার্থ বা মূল রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে শ্রম, শক্তি ব্যয় করতে অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠে। ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে সাভাবিকভাবেই ছাত্র নেতাদের লোভ, লালসা বেড়ে যায়।

বিভিন্ন অপরাধে ছাত্র নেতাদের সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হতে থাকায় ছাত্র রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে, অনেকে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করছে না, ছাত্র রাজনীতি বন্ধেরও দাবি তুলছে, অনেকে সংস্কারের আবশ্যকতার কথা জানাচ্ছে। তবে এরশাদ সাহেব তার দল জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন বিলুপ্ত ঘোষণা করে যেভাবে নিজের পতন ত্বরান্বিত করেছিলেন সেই ঝুঁকি অন্য কোন রাজনৈতিক দল নেবে বলে মনে হয় না। আসলে স্বাধীন বা লেজুড়বৃত্তি যেভাবেই থাকুক না কেন সরকার ও গডফাদারদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে ছাত্র সংগঠনের ফ্যাসিজম বন্ধ হবে না। ছাত্রদের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ নয়, লেদ মেশিনে বাংলাদেশেও নাকি এ সব হাল্কা অস্ত্র বানানো সম্ভব, ভারত থেকে তো অহর্নিশ এইসব অস্ত্র আসছে। তাদের অপহরণ বাণিজ্য ও

চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজের জন্য অস্ত্র প্রয়োজন, কিন্তু সেই অস্ত্র ব্যবহারে যদি অনুকূল পরিবেশ থাকে তখন তাদের 'রুধিবে' কে? স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠন দেশ স্বাধীনের পর গ্রামে গ্রামে গিয়ে অসহায় মানুষদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে, এই ছাত্ররাই সেলাইন ও রুটি বানিয়ে বিশুদ্ধ পানিসহ এখনও বন্যাকবলিত মানুষদের বাঁচাতে জীবনপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ এই ছাত্র নেতাদের অন্যরূপ ফুটে উঠে আওরঙ্গ, বাবলু, নিরু, অভির রুদ্রমূর্তিতে। 'তুমি যা বলো তার সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার সেই কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আমৃত্যু লড়ে যাব'- ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের এই অমর বাণী তাদের মুখস্ত, তারা তাদের বক্তৃতায় এমন মুখরোচক শত শত বাণী উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু নিজেরা পালন করে না এবং পালন করে না বলেই শুধু ভিন্ন মত পোষণ করার জন্য এরা আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করে। ছাত্র রাজনীতির এ অধঃপতন রোধে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল আন্তরিক নয়,- নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পেশীশক্তির অধিকারী ছাত্রদেরই শুধু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করে থাকে। ছাত্র নেতৃত্ব এত লাভজনক যে, আদুভাই হওয়ার পরও এদের ছাত্রত্ব ঘোচে না, হাজার হাজার মোটরসাইকেলের সংবর্ধনায় এরা মুহূর্তে রাজাধিরাজ বনে যায়, এরা নামিদামি গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করে, জাঁকজমকপূর্ণ ফ্ল্যাটে এদের বসবাস। সব কিছুই মূল রাজনৈতিক নেতারা

জানেন, দেখেন; কিন্তু শেখ হাসিনা না দেখলে এদের হুঁশ হয় না, শেখ হাসিনার দেখার সঙ্গে সঙ্গে ‘হুক্কাহুয়া’ রবে দলের অন্য নেতারা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরদের দলীয় আদর্শপুষ্ট হওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই; কিন্তু এই লোকগুলো শুধু দলের আশীর্বাদে ক্ষমতাবান বলে মেরুদণ্ডহীন, তারা নীতিনিষ্ঠ কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। তাই প্রথমে মূল রাজনৈতিক দলের পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। মূল রাজনৈতিক দলের নেতারা শুদ্ধ হলে ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হওয়ার সুযোগই থাকবে না। কলুষমুক্ত ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত না হলে, ছাত্র রাজনীতির পচন ঠেকানো না গেলে আবরার হত্যায় অংশগ্রহণকারী আকাশের পিতা ভ্যানচালক আতিকুল ইসলামের মতো সব অভিভাবকের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা ও শঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার কঠোর মনোভাব ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়তায় মানুষ ভরসা খুঁজে পাচ্ছে বলেই সম্ভবত এখনও হতাশা সবাইকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

[লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক]
zeauddinahmed@gmail.com